Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.138-149
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রামমোহন রায়: একুশ শতকের পাঠ

ড. সায়ক মুখার্জি

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:

Raja Ram Mohan Roy, a visionary reformer of the early 19th century in India, left an indelible mark on Nation and its culture through his tireless efforts for social reformation and his progressive ideas. He was a staunch advocate of abolishing inhuman regressive practices. His relentless campaign against caste-based discrimination and his push for women's education were revolutionary at a time when these problems were deeply entrenched in society. Ram Mohan Roy's work continues to be highly relevant in today's society. His emphasis on education as a means of empowerment has paved the way for increased literacy and gender equality in India. His vision for a more just and inclusive society laid the groundwork for subsequent social reform movements and even influenced the drafting of the Indian Constitution. In today's world, where social inequalities persist, Ram Mohan Roy's principles of rationality, individual rights, and social justice continue to inspire change-makers and advocates for a fairer society. His legacy serves as a reminder that even in the face of deeply rooted traditions, one person's dedication to progressive ideals can catalyze lasting social transformation. Rammohan Roy remains an icon of social reform, whose ideas and actions resonate with the ongoing quest for a more equitable and just society. In this article, we will revisit and reanalyze the profound life and invaluable contributions of Rammohan Roy.

Key Words: Raja Ramohan Roy, Nineteenth Century, Social Justice, Reformer, Progressive Ideas.

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে উপনীত হয়ে মানবের যুক্তি, বিজ্ঞান আর প্রগতির উৎকর্ষ আজ বিপুল মহিমায় উদ্ভাসিত। মানব সভ্যতার সাধনা যে অগ্রগতির পথে একদিন শুরু হয়েছিল, তার সিদ্ধির অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার এই পথ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষের জীবনকে যেমন সুগম করেছে, তেমনই অর্থ আর কীর্তির প্রতিযোগিতা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে। রাজনৈতিক স্বার্থ আজ ব্যক্তি পুঁজির করায়ত্ব। জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রধারণা ব্যক্তি-মুনাফার কায়েমি স্বার্থের কাছে ম্লান হয়ে পর্যবসিত হয়েছে বিত্ত আর বৈভব উৎপাদনের যন্ত্রে। বিশ্বায়ন-পরবর্তী পৃথিবী ক্রমাগত ছোট হতে হতে স্যাটেলাইট, কেবিল আর অন্তর্জালের মর্মান্তিক বাঁধনে সংকুচিত। ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন বিকাশ তাই আজ প্রশ্নের মুখে। বিশ্বগ্রামের উদারনৈতিক ভাবনা যখন ক্রম-হ্রাসমান পরিসরে মানুষের স্বাভাবিক বৌদ্ধিক

অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখনই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এই বদ্ধতার কারণ অনুসন্ধানের। প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুনভাবে ইতিহাস পর্যবেক্ষণের। কারণ, তার মধ্য দিয়েই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে বর্তমান সময়ের পথের দিশা। ইতিহাসের নানান সময়ের যে সমস্ত চিন্তানায়কেরা তাঁদের চিন্তা ও কর্মের দ্বারা মানব সভ্যতাকে অগ্রগতির পথে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মূল্যায়ন হয়তো এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে হয়ে উঠতে পারে আলোকবর্তিকা। এমনই একজনের কথা আজ বলতে বসেছি, যাঁর চিন্তা-ভাবনা, ব্যক্তিজীবন এবং কর্মময়তা শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্ব ইতিহাসের ক্ষেত্রে বর্তমানেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অথচ, যাঁকে সাহিত্যের ইতিহাস বইয়ের পাতায় একটি বা দুটি অনুচ্ছেদেই আমরা স্থান দিয়েছি কেবল। তিনি এই ভারতের, এই বাংলার সন্তান; 'প্রথম আধুনিক মানুষ' রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহনের জন্ম ১৭৭২, মৃত্যু ১৮৩৩ সালে। সেই সময় যুগসন্ধিক্ষণের সময়। বেলা শেষ আর দিনের প্রারম্ভের অতি গুরুত্বপূর্ণ জটিল সহাবস্থান। একদিকে পুরাতনের ছায়াবসান অন্যদিকে নতুনের রক্তিম আভা। উনিশ শতক তেমনই এক সময়। প্রাচীন ভারতের জ্ঞানচর্চা আর আধুনিক ইউরোপীয় চেতনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে উদ্বেল এই কাল। মধ্যযুগের ধ্যানধারণা আধুনিক যুক্তিবাদী মননশীলতার কাছে পর্যুদস্ত হবার সময় এই উনিশ শতক। তখন বাঙালি তার স্বীয় ইতিহাসে দৃষ্টি দিয়ে খুঁজতে চেয়েছিল সেখানে এমন কিছু আছে কিনা যা নিয়ে এই নতুন চিন্তার স্রোতের মুখোমুখি দাঁড়ানো যায়। নতুন এবং পুরাতনের দ্বন্দ্বে, তর্কে, বিতর্কে এই সময় ছিল উত্তাল। পুরানোপন্থিরা চাইছিলেন অতীত কালের রীতি-নীতি-সংস্কৃতির পুনরুত্থান, আর আধুনিকেরা নব্য যুক্তিবাদী উদারনৈতিক চিন্তাভাবনাকেই করতে চেয়েছিলেন পাথেয়। তবে, যেহেতু বৌদ্ধিক এই সংঘাত সমাজের উচ্চ অংশেই কেবল সীমায়িত ছিল, তাই পরবর্তীকালে গোপাল হালদারের মতো কোনও কোনও তাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলেছেন উনিশ শতকের এই তথাকথিত 'নবজাগরণ'কে আদৌ সামগ্রিক জাগরণ বলা যায় কি না। সে বিতর্কে না গিয়েও আমরা এটুকু বলতে পারি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ইতালি বা অন্যান্য স্বাধীন দেশের মতো জাগরণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই জাগরণকে রেনেসাঁর সঙ্গে তুলনা করা যাক বা না যাক; বৈজ্ঞানিক ভাবনায় সমৃদ্ধ, যুক্তিবাদী প্রগতিশীল বেশ কিছু মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় উনিশ শতকের তমসাচ্ছন্ন সামাজ ও সংস্কৃতিতে এক নতুন মূল্যবোধের জন্ম যে হয়েছিল সে কথা অনস্বীকার্য।

একদিন জ্ঞান-বুদ্ধি-শিল্পের সাধনা যে ভারতকে পৌঁছে দিয়েছিল উৎকর্ষের চরম শিখরে, সমগ্র বিশ্বের কাছে ত্যাগ-তিতিক্ষা-নিষ্ঠা-ঐকান্তিকতার যে দীপালোক ভারতবাসী জ্বেলেছিল, দীর্ঘ বৈদেশিক শাসন আর অন্তর্কলহে জর্জরিত হয়ে সেই উজ্জ্বল আলো ততদিনে নিষ্প্রভ হয়েছে। উনিশ শতকের শুরুতে ভারত তথা বাংলার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণীধানযোগ্য:

"শত শত বৎসর চলে গেল... ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূর-দূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন। তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হল অবরুদ্ধ, নির্জীব হল নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি। সর্বজনের প্রশস্ত রাজপথকে তারা বাধাগ্রস্ত করন; খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে।"[১]

এই হুবির সময়েই মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত কিছুসংখ্যক মানুষ যাঁরা প্রয়াসী হয়েছিলেন দীর্ঘ এই রাত্রি থেকে স্বজাতি, স্বদেশকে নব-চেতনায় আলোকিত করতে সেই দলেরই পুরোধা রাজা রামমোহন রায়। যিনি প্রথম নির্ভীক, যৌক্তিক উদারনৈতিক মানবতার কথা বলেন। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সৃষ্টির মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে আধুনিকতা।

পিতা-মাতার উৎসাহে এবং পরবর্তীকালে নিজের চেষ্টায় তাঁর পড়াশোনা। শৈশবের শিক্ষা হয়েছিল তাঁর নিজের গ্রামে। তারপর, পরিবারের উদ্যোগে কাশীতে গিয়ে জানলেন বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, তন্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি সংহিতা, ন্যায় শাস্ত্র, শৈব দর্শন প্রভৃতি। কাশীতে বিপুল অধ্যয়নের মধ্য দিয়েই রামমোহন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন চিন্তার দৈন্যকে; বুঝেছিলেন, তত্ত্ব আর প্রয়োগের ব্যবধানের ঘোলাজলেই বাসা বেঁধেছে রক্ষণশীলতা। অব্যবহিত পরে তাঁকে পাঠানো হয় পাটনায়। সেখানে তিনি শিখলেন, আরবি-ফারসি। পাটনা থেকে ফিরে এসে তাঁর গ্রামের কাছেই পালপাড়া নিবাসী নন্দকুমার কাব্যালঙ্কারের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় দর্শনের নিগুঢ় তত্ত্বকে যত জেনেছেন, তাঁর যুক্তিবাদী মন ততই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে অখণ্ড একের সত্য উপলব্ধিতে।

খুব ছোট থেকেই শুরু হয় তাঁর সত্যের অনুসন্ধান। জ্ঞান অর্জন রামমোহনকে অন্তর থেকে বদলে দিল। যিনি ছিলেন প্রবল কৃষ্ণভক্ত, ভক্তিবাদী তিনি রূপান্তরিত হলেন যুক্তিবাদী ব্যক্তিতে। খুব কম বয়সেই রামমোহনের চিন্তার এই বদল তাঁর পরিবারকে উদ্বিগ্ন করেছিল নিশ্চয়। তিনি আবিষ্কার করলেন বেদ এবং উপনিষদে যে অখণ্ড অদৃশ্য একক ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে যার সৃষ্ট এই জগৎ, যিনি জগতে সর্বভূতে বিদ্যমান সেই একম অদ্বিতীয়ম-এর সঙ্গে ইসলামীয় একেশ্বরবাদের খুব পার্থক্য নেই। তিনি তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে উপলব্ধি করলেন জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বর এক, অভিন্ন, অদৃশ্য, নিরাকার। তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হল মূর্তিপূজা, সোচ্চারের বিরোধিতা করলেন হিন্দুর নানাবিধ দেব-দেবী কল্পনার। ফলে পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরমে উঠল। ঘর ছাড়লেন তিনি। নানাবিধ ব্যবসা করে ইংরেজ সিভিলিয়ান জন ডিগবির কাছে দেওয়ানির কাজ করে তিনি যেমন হয়ে উঠলেন অর্থবান, পাশাপাশি চলছিল বিপুল অধ্যয়ন। যে সত্য তিনি জেনেছেন তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে মানুষের মধ্যে, জাগিয়ে তুলতে হবে তাঁর দেশকে, জাতিকে। শুধু হিন্দু শাস্ত্র নয়, তাঁর গভীর পান্ডিত্য ছিল ইসলামীয় ধর্ম দর্শন, আরব্য তর্কশাস্ত্র, কোরাণ, ফারসি দর্শন, খ্রিস্ট দর্শন প্রভৃতিতেও। পড়েছিলেন হাফিজের কবিতা। একইসঙ্গে তিনি গভীরভাবে চর্চা করেছেন আধুনিক যুক্তিবাদী ইউরোপীয় দর্শন যথা লিবনিজ, ডেভিড হিউম, প্লেটো, ফ্রান্সিস বেকন ও সমকালীন বিভিন্ন দার্শনিকের রচনা।

কলকাতায় এসে (১৮০১-০২) তিনি মনোনিবেশ করলেন লেখালিখিতে। ১৮০২ থেকেই পরবর্তী পাঁচ-দশ বছরের মধ্যেই তিনি অনুবাদ করে ফেললেন বেদান্ত গ্রন্থ আর পাঁচটি উপনিষদ। যে হিন্দু ধর্মের কল্যানকল্পে তিনি কলম ধরলেন, তখন সেই হিন্দু ধর্মের অস্তিত্বই ছিল বিপন্ন। দেশের মানুষ কেউ বৈষ্ণব, কেউ শাক্ত, শৈব কেউ, কেউ বা রামায়িত। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, খাদ্যাখাদ্যের বিচারের আকণ্ঠ কুসংস্কারে নিমজ্জিত মানুষের সামনে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর অভিমত। তিনি বললেন, "...সকল দেবতার এবং সকল বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিলে বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় এবং এই জগতের স্রষ্টা অনেককে মানতে হয়। ইহা বুদ্ধির এবং বেদের বিরুদ্ধ মত হয়।"[২] তাঁর কাছে ক্ষতিকারক মনে হয়েছে পুরোহিততন্ত্রের শাসনে শাসিত জাতপাতের ভেদাভেদ জর্জরিত পৌত্তলিক সংস্কারাশ্রয়ী সমকালীন হিন্দু ধর্ম

ও সেই ধর্মকে কেন্দ্র করে ফুলে ফেঁপে ওঠা ধর্মব্যবসাকে। তাই তিনি প্রবলভাবে বিরোধিতা করতেন, যাগ-যজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠানের। তিনি জানতেন মানুষের অজ্ঞানতা এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষী পুরোহিত সমাজ আত্মস্যাৎ করে তাদের সর্বস্ব। তাই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে তার অন্তঃসারশূন্যতা প্রসঙ্গে লিখলেন, "পরব্রহ্মজ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা কোন কার্যে আইসে না। ...যে সকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন তাঁহারা বাহ্যেতে কোনো যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষু শোস্ত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন।"[৩] তিনি হিন্দু ধর্মের বেদ উপনিষদের পরম সত্যকে জেনেছিলেন ধ্রুব রূপে। এরই সঙ্গে তাঁর চেতনায় এসে মিশেছে রুশোর সাম্যবাদী চিন্তা, ভলতেয়ারের ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, টমাস পেন, মিল, বেন্থাম, হিউম, রিকারড এর যুক্তিবাদ। তিনি যে কেবল হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদের মধ্যেকার প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মুখর হয়েছিলেন তা নয়; ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যেকার অযৌক্তিক বিষয়গুলির প্রতিও তিনি ছিলেন সমান খড়্গহস্ত।

ভারতবরর্ষের নানান স্থানে যেমন তিনি ঘুরেছেন, তেমনই সুদূরকে জানবার দূরন্ত আগ্রহে তিনি পাড়ি দিয়েছেন হিমালয়ের পথে তিব্বতে। জীবিকার জন্য মুর্শিদাবাদ, রংপুর, ভাগলপুর প্রভৃতি নানান স্থানে সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যে ঘুরেছেন। তাঁদের জীবনযাত্রাকে দেখেছেন নিবিড়ভাবে। গভীর মমতায় অনুধাবন করেছেন সাধারণ মানুষের শোচনীয় অবস্থাকে। তাই তিনি লিখতে পেরেছেন, "In Bengal they live most commonly on rice with a few vegetables, salt, hot spices and fish. I have however ofen observed the poorer classes living on rice and salt only. In the upper provinces they use wheaten flour instead of rice, and the poorer classes frequently use bajra (millet) etc; the Mohammedans in all parts who can afford it add fowl and other animal food."[৪]

১৮০৩-৪ সাল নাগাদ তিনি 'তুহফৎ-উল-মুওয়াহিদ্দীন' নামে একটি বই লেখেন, যার ভাষা ছিল ফারসি, আর ভূমিকা লিখেছিলেন আরবিতে। জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা তিনি সারাজীবন অনুসরণ করেছেন তার প্রথম আভাস পাওয়া যায় এই বইটিতে। যার সারকথা, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সেই এক স্রষ্টার সৃষ্টি। তাই কোনও ব্যক্তিরই উচিৎ নয় কাউকে আঘাত করা। একমাত্র সহানুভূতি আর সহনশীলতার পথ ধরেই আসতে পারে মানবের মুক্তি।

রামমোহনের এই নবধর্মমত গোঁড়া রক্ষণশীলদের পছন্দ হয়নি। তাঁরা নানাভাবে তাঁকে অপদস্ত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তবুও কলকাতায় রামমোহন কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীকে তাঁর পাশে পেলেন। তাঁদের মধ্যে ভারতপ্রেমিক ডেভিড হেয়ার, টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী, তেলেনিপাড়ার জমিদার অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূকৈলাসের রাজা কালীনাথ ঘোষাল, ইংরেজ পাদরি অ্যাডাম, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ। ১৮১৪ সালে তাঁর বাড়িতে এঁদেরই সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন 'আত্মীয়সভা'। জাতিভেদকে অস্বীকার করে সমস্ত মানুষের জন্য এই সভার দ্বার ছিল অবারিত। এখানে আলোচনা হত, ধর্ম ও দর্শনের নানা খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ; পাশাপাশি চলত বিভিন্ন সামাজিক ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ। সাধারণ মানুষের কাছে হিন্দু ধর্মের প্রকৃত সত্যকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রামমোহন ছিলেন অক্লান্ত। ১৮১৫-১৭ এর মধ্যে লিখলেন 'বেদান্ত গ্রন্থ' যার হিন্দি অনুবাদ 'বেদান্ত সার', তলবকার উপনিষৎ' অর্থাৎ 'কেনোপনিষৎ' 'ঈশোপনিষৎ', 'কঠোপনিষৎ', 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ' এবং 'আত্মানাত্মবিবেক'।

রামমোহনের পথ ছিল যুক্তির, অনুসন্ধান ছিল বৈজ্ঞানিক। তাঁর ধর্মীয় সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য সমগ্র মানবজাতির ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করা। হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতা তাঁকে আঘাত করত। তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন, সেই ধর্মের উন্মেষের জন্য, যাতে মানবতার প্রতিষ্ঠা হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ডিগবি সাহেবকে লিখিত একটি পত্রে।

"…..Hindus are not worse than the generality of Christians in Europe and America; but I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise."[৫]

রামমোহন মনে করতেন, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম অংশত ঠিক, তাই কোনও মতই সম্পূর্ণ নয়। তিনি ইসলাম, খ্রিস্ট, বৌদ্ধ ধর্মের যা কিছু গ্রহনযোগ্য তার সঙ্গে মিলিয়েছেন বৈদান্তিক সত্যকে। তাঁর যুক্তি হল, যেহেতু ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে ব্রহ্ম সর্বমানবে বিদ্যমান, তাই বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ অবশ্য কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ব্রতী ছিলেন আজীবন। কলকাতায় আসবার পর বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন অ্যাংলো হিন্দু স্কুল। উদ্যেশ্য, তাঁর স্বদেশবাসী ছাত্রদের শেখাবেন আধুনিক যুক্তিবাদী উদারনৈতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান। ছাত্র তেমনভাবে পাওয়া যায়নি প্রথমদিকে। তবুও তিনি তো দমবার পাত্র নন। নিজের পুত্র রামপ্রসাদ, বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, নন্দকিশোর বসুর পুত্র রাজনারায়নের মতো গুটি কয়েক শিক্ষার্থীকে দিয়ে শুরু হল রামমোহনের শিক্ষকতা। এর কিছু পরেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বেদান্ত মহাবিদ্যালয়। সেখানেই না থেমে তিনি স্কটল্যান্ডের মিশনারি চার্চের সাথে যোগাযোগ করে আনিয়ে নিলেন আলেকজান্ডার ডাফকে। তাঁকে উদ্বুদ্ধ করলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। ডাফ-ও রাজি। কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ি চাই। রামমোহনই ব্যবস্থা করলেন সেই বাড়ির। দ্বারে দ্বারে ঘুরে সংগ্রহ করলেন ছাত্র। শুরু হল, বিদ্যালয়। আজও সেই স্কটিস চার্চ কলেজ আপন মহিমায় উজ্জ্বল। রামমোহন আন্তরিকভাবেই চেয়েছিলেন এদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সর্বাধুনিক বিদ্যার সুযোগ করে দিতে। তাই তাঁর সমকালে শিক্ষাকেন্দ্রিক সমস্ত প্রগতিশীল উদ্যোগে তিনি সক্রিয়ভাবে শামিল ছিলেন। ১৮১৬ সালের মে মাসে তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের বাড়িতে এক সভা বসে, যার উদ্যেশ্য কলকাতায় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। যা হয়ে উঠবে আধুনিক উদারবাদী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। রামমোহনের বন্ধু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এ ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী। তিনিও ছিলেন এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। কিন্তু সমস্যা ঘটালেন গোঁড়া রক্ষণশীল একদল হিন্দু সমাজপতি। 'ম্লেচ্ছ' রামমোহনের সঙ্গে তাঁরা কোনও উদ্যোগে থাকতে রাজি নন। সরে দাঁড়ালেন তিনি। প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু কলেজ (১৮১৭), পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজ। শিক্ষাব্রতী রামমোহন অবিরাম কাজ করে গেছেন শিক্ষার উন্নতিতে। একইসঙ্গে তিনি তাঁর আদর্শকে ক্রমাগত মানুষের মধ্যে স্পষ্ট করে বলেছেন। তাছাড়াও প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যুক্ত থেকেছেন সমকালীন প্রগতিশীল সভা-সমিতিতে। কিছু পরে ১৮২১ সালে ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি বন্ধু ইংরেজ পাদরি অ্যাডামকে নিয়ে তাদের সঙ্গী হন।

১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্মসমাজ। প্রথমে কমল বসুর বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলেছিল এই সমাজের কাজকর্ম। কিন্তু রামমোহন অনুভব করছিলেন এমন একটি স্থান প্রয়োজন যেখানে সকল

ধর্মের মানুষ এসে সাধনা করতে পারেন, নিরাকার একের উপাসনা করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮২৯ সালে জোড়াসাঁকো অঞ্চলে একটি জমি কেনা হল, যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি উপাসনা গৃহ। সেই জমির দলিলে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের উদ্যেশ্য ও আদর্শ প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বললেন যা উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে তো বটেই, বর্তমান সময়েও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি এমন একটি উপাসনা গৃহের পরিকল্পনা করলেন যেখানে যেকোনও ধর্মের মানুষ এসে মিলিত হবে এক 'Public Meeting' এ।

"….for a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adoration of the Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe but not under or by any other name designation or title…"[৬]

পরবরর্তীকালে ভারতীয় সংবিধানে যে উদার, গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ঘোষণা হয়েছিল তার প্রাক-রূপ দেখতে পাওয়া যায় রামমোহন রায় রচিত এই দলিলে। স্বদেশ, সমাজ সর্বোপরি সমগ্র বিশ্বকে রামমোহন দেখেছিলেন এক উদার, মরমী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

বাংলা গদ্যচর্চার ইতিহাসে রামমোহনের ভূমিকা বহু আলোচিত। সে আলোচনা থেকে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা হল, ব্যবহারিক ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার প্রয়োগে তাঁর উদ্যোগ। ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি প্রভৃতি আরও কিছু ভাষা (প্রায় ৯টি)-য় তাঁর পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বাংলা ভাষাকে বেছে নিয়েছেন ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রচারের জন্য। এবং একের পর এক 'বিচার', 'প্রস্তাব' প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে তিনিই প্রথম দেখালেন কাব্য, অনুবাদ বা মনোরনঞ্জনের ক্ষেত্র ছাড়াও বাংলা ভাষাকে যুক্তি-প্রতিযুক্তির ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এর আগে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসুর মতো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা পেশাগত প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের চর্চা করেছেন। কিন্তু, আন্তরিক তাগিদ থেকে রামমোহনই প্রথম তাঁর 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার', 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ', 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রভৃতি বইগুলির মাধ্যমে বাংলা গদ্যের উন্নতিতে সচেষ্ট হন। বিশেষ করে আমাদের মনে রাখতে হবে, রামমোহনের এই বাংলা গদ্য চর্চার নেপথ্যেও রয়েছে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য।
প্রথমত, ভাষা একটি জাতির মেরুদণ্ড। সেই ভাষাকেই তিনি করতে চেয়েছেন ঋজু, ব্যবহারিক।
দ্বিতীয়ত, তিনি যে আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছেন, তাকেই সহজ ভাষায় ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে।

এই স্বদেশবাসী কিন্তু শুধু বোদ্ধা বা ইংরেজি শিক্ষিত কলকাতাবাসী নন বরং একেবারে সাধারণ মানুষ। তাঁর আন্তরিকতা আরও বেশি করে প্রকাশিত হয় যখন দেখি এই গদ্যচর্চার পাশাপাশি স্বীয় অনুভব মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি লেখেন বেশকিছু ব্রাহ্মসংগীত। এবং সেখানেও তাঁর আধ্যাত্মিক মননের ছাপ সুস্পষ্ট।

"মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায়, কিরূপে সম্ভবে।

ইচ্ছা মাত্র করিলে যে বিশ্বের-প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে
ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এইমাত্র নিতান্ত জানিবে।"[৭]

শিক্ষা সম্পর্কে রামমোহনের ভাবনা যুগান্তকারী। শুধু এই কারণেই নয় যে তিনি মাতৃভাষায় যুক্তিনির্ভর শিক্ষার পক্ষে কথা বলেছিলেন। বরং তাঁর আরও একটি প্রতিবাদী পদক্ষেপ তাঁকে ভারতের আধুনিক শিক্ষার পুরোধা ব্যক্তি হিসেবে স্মরণীয় করে রেখেছে- যখন শাসক সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় শিক্ষাখাতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার করা হবে সংস্কৃত শিক্ষা এবং প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তখন রামমোহন ক্ষুব্ধ হন। ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত চিঠিতে তিনি প্রশ্ন তোলেন ইউরোপীয় ছাত্রছাত্রীরা যদি ইউরোপীয় দর্শন পড়তে পারে ভারতে কেন তা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

"...If it had been mtended to keep the British nation in ignorance of real knowledge the Bacoman philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sangscrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British Legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathamatics, natural philosophy, chemistry and anatomy with other useful scieces which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a college furnished with the necessary books, instruments and other apparatus."[৮]

তাঁর ভাবনায় দেখি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার এক সুচারু সমন্বয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করার পাশাপাশি তিনি চেয়েছিলেন তারা পড়ুক ফ্রান্সিস বেকন, জন লক, বেন্থাম, রুশোর দর্শন। তাদের পরিচয় ঘটুক স্কট, বায়রণ প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে। তাঁর উপরিউক্ত আবেদন ইংরেজ শাসক মানেননি। পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও প্রায় এই একই বিষয়ে লড়াই করতে হয়েছিল।

দেশের সেবায় সত্য ও নিষ্ঠার পথে যাঁরা অগ্রসর হন তাঁদের সাথে শাসকের সংঘাত অপরিহার্য। বিশেষত, সে দেশ যদি হয় ঔপনিবেশিক শক্তির কারায়ত্ত। তাই ১৮২৩ সালে নতুন অধ্যাদেশের মাধ্যমে যখন শাসক বলল সাংবাদিকতা বা সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য শাসকের অনুমতি নিতে হবে, তখনও প্রতিবাদ করলেন রামমোহন। সে সময় তিনি তিনটি প্রত্রিকা সম্পাদনা করতেন- ব্রাহ্মণসেবধি বা ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন (১৮২১), সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১), মিরাৎ-উল-আখবার (১৮২২)। শেষোক্ত পত্রিকাটি রামমোহন ফারসি ভাষায় প্রকাশ শুরু করেন সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশের কয়েক মাস পর থেকেই। পত্রিকাটি ইরানেও পাঠানো হত। এই পত্রিকাটি তিনি বন্ধ করে দেন উক্ত অধ্যাদেশের প্রতিবাদে। কোনও অপমানজনক শর্ত রামমোহনের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। বাক স্বাধীনতার জন্য, মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য প্রায় আড়াইশো বছর আগে এক বাঙালির সংগ্রাম বিশেষ গৌরবের। এই ঘটনার প্রতিবাদে 'King in council' এবং ইংল্যান্ডের রাজাকে তিনি যে দুটি প্রতিবাদপত্র পাঠালেন তাতে দাবি করেন, ইংল্যান্ডে সামাজিক অধিকার রূপে মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে অথচ ভারতে তা হবে না এমন চলতে পারে না। তিনি আরও বললেন স্বাধীন নির্ভীক গণমাধ্যমের কাজ সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরে শাসন ব্যবস্থাকে সচল রাখা। স্বাধীন গণমাধ্যমের কারণে পৃথিবীর কোথাও বিদ্রোহ বা বিপ্লব সংগঠিত হয়নি। বরং যেখানেই শাসক

সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে সেখানেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর এই অভিমত যে দেশ-কাল নির্বিশেষে কতটা প্রাসঙ্গিক তা সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন।

দেশবাসী কিন্তু রামমোহনের এই প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনাকে মেনে নিতে পারেননি। রামমোহন চেয়েছিলেন অন্ধকারকে দূর করতে। তাই রক্ষণশীল মানুষরা যাঁরা নানান স্বার্থে এই অন্ধকারকে জারি রাখতে চান তাঁরা সবরকমভাবেই হেনস্থা করেছেন তাঁকে। তিনি পুরোহিততন্ত্র, পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করায় গোঁড়া হিন্দু ধর্মের সমর্থকরা তাঁর উপরে ছিল খড়্গহস্ত। তিনি ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যেকার গোঁড়ামি, কুসংস্কার প্রভৃতি নানান খারাপ দিকগুলির স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন। তাই 'জবরদস্ত মৌলবি' রামমোহনকে গোঁড়া মুসলমানরাও স্বীকার করতে পারেননি। তেমনই অখুশি ছিলেন গোঁড়া খ্রিস্টান মিশনারিরা। 'Percept of Jesus' বইতে যেভাবে তিনি যিশু খ্রিস্টের অলৌকিক জীবনকে স্বীকার না করে তাঁর উপদেশগুলিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তাতে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারকরা তাঁকে শত্রুই মনে করেছেন। এঁদেরই প্রবল সমালোচনার উত্তরে নিজ যুক্তির সমর্থনে রামমোহন তিনটি বই লেখেন:

১। 'An Appeal to the Christian Public' ২। 'Second Appeal to the Christian Public' ৩। 'Final Appeal to the Christian Public'

একের পর এক অন্যায়কারী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর এই বিদ্রোহ তাঁর ব্যক্তিজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। তাঁর বাড়ির চারিপাশ ঘিরে দল বেঁধে তাঁর নামে কুৎসাকীর্তন করে আঁধারের পক্ষপাতিরা। তারা ব্যঙ্গ করেছে ছড়া কেটে:

ব্যাটার সুরায় মেলে কূল/ ব্যাটার বাড়ি খানাকুল
ওঁ তৎসৎ বলে ব্যাটা/ বানিয়েছে স্কুল।

তাঁর প্রতি আক্রমন এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তাঁকে পুলিশের সাহায্যও নিতে হয়। তাঁর জীবনীকারদের রচনা থেকে জানা যায় যে, আত্মরক্ষার জন্য তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা জামার তলায় 'কিরিচ' পরে বের হতেন।

ইংরেজদের সঙ্গেও তিনি চাইতেন সমকক্ষতার সম্পর্ক। তাঁদের প্রভু বলে তিনি কখনই স্বীকার করেননি। ১৮০৯ সালের গোড়ার দিকে ভাগলপুরে থাকাকালীন সেখানকার কালেক্টর হ্যামিল্টন সাহেবের তাঁর প্রতি অশিষ্ট ব্যবহারের প্রতিবাদে লর্ড মিন্টোকে চিঠি লিখে প্রতিকার দাবি করেন। এই ঘটনা রামমোহনের চারিত্রিক দৃঢ়তার আরও একটি অভিজ্ঞান।

গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি যেসমস্ত কদর্য সংস্কার বাঙালির জীবনকে করে রেখেছিল তমসাচ্ছন্ন, তার মধ্যে বোধ হয় সতীদাহ ছিল সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রথা। শোনা যায়, রামমোহনের দাদা জগমোহনের স্ত্রী অলোকমণি দেবী সতী হয়েছিলেন। অবশ্যই স্বেচ্ছায় নয়। রামমোহন চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এই মর্মান্তিক প্রথা তিনি বন্ধ করবেন। শুরু করলেন লেখালিখি, তর্ক-বিতর্ক। বৃহস্পতি সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক সংহিতা ইত্যাদি হিন্দু শাস্ত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে দেখালেন শাস্ত্রে বারবার স্ত্রী হত্যাকে পাপ বলা হয়েছে। তিনি শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন সতীদাহ শুধু নিষিদ্ধই নয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হওয়া উচিৎ। তিনি নিজে নানান অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন এই নির্মম প্রথা বন্ধ করার জন্য। বেন্টিং-এর সহায়তায় ১৮২৯ এর ডিসেম্বরে আইন করে এ প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা হলেও রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি গোঁড়া হিন্দুদের নেতৃত্বে এ বিষয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। যদিও রামমোহন

পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন মানুষের চেতনায়। তাই আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার ব্যাপারে তিনি তেমন উৎসাহ দেখাননি। কিন্তু আইন প্রণীত হওয়ার পর তিনি তা কার্যকর করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, সই সংগ্রহ করে দাবিপত্র জমা দিয়েছেন সরকারের কাছে।

শুধুই সতীদাহ প্রথা রদ করেই নারীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ঘটে চলা অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন তা নয়; রামমোহনই সম্ভবত প্রথম পিতৃ সম্পত্তিতে পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকারের পক্ষে সওয়াল করেন। এছাড়া, ১৮২২ সালে লেখা 'Ancient Rights of the Female' প্রবন্ধে তিনি বিধবা মা, অবিবাহিতা ও বিধবা কন্যাদের যাবতীয় আইনের বিষয়ে পুরুষদের উপর নির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। সম্পত্তির লোভেই বা ভরণপোষণের দায় এড়ানোর জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সর্বদাই নারীকে বঞ্চিত করতে চেয়েছে। রামমোহন সেই পুরুষতন্ত্রের মূলেই সশব্দ কুঠারাঘাত করেছেন। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর এবং যে সমস্ত প্রগতিশীল সংস্কারকেরা সমাজের বুক থেকে সরাতে চেয়েছেন কুসংস্কার আর স্বার্থের আবর্জনা, তাঁদের সবার পথের দিশা হয়ে উঠেছেন তিনি। এভাবেই রামমোহনের প্রতিটি সংস্কারমুখী পদক্ষেপ প্রস্তুত করেছে পরবর্তী আন্দোলনের পটভূমি।

রামমোহন নিজে ছিলেন জমিদার। তবু তিনি প্রজার অধিকারের স্বপক্ষে ও শোষণের বিপক্ষে কলম ধরেছেন। কৃষকের জমি ও ফসলের অধিকার আইন সিদ্ধ করার কথা বলেছেন। রাজস্ব ব্যবস্থার সংশোধনের দাবি করেছেন। ছিয়ানব্বই বিঘা জমি, তিনটে তালুক এবং কলকাতার বুকে বেশ কয়েকটি বাড়ির মালিক রামমোহন রায়ের এই ভূমিকা শোষণমুক্তির সংগ্রামী পথের পথিক যাঁরা তাঁদের কাছে নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার।

উনিশ শতকের ভারতের সাংস্কৃতিক মনন রামমোহন রায়ের মত প্রতিভাকে যথাযথ মূল্যে ধারণ বা মূল্যায়ন কোনওটাই করতে পারেনি। একক লড়াইয়ে তাই তিনি ক্রমাগত একা হয়েছেন। তবু কিছু মানুষ সে অন্ধকারেও তাঁর সাথে পথ হেঁটেছিল। রামমোহন চাইছিলেন পৃথিবীতে স্বাধীন মানুষের মাথা উঁচু করে বাঁচবার অধিকার যেখানে স্বীকৃত, সেই পশ্চিমে যেতে। সুযোগও এসে গেল। কোম্পানির বিরুদ্ধে দিল্লির নামমাত্র বাদশা কিছু অভিযোগ জানানোর জন্য ইংল্যান্ডে প্রতিনিধি পাঠাতে চাইছিলেন। এমন কাজে যোগ্যতম ব্যক্তি রামমোহন রায় ছাড়া আর কে? বাদশা তাঁকে রাজা উপাধি দিলেন। সিদ্ধান্ত হল, তিনিই যাবেন বাদশার প্রতিনিধি হয়ে। কিন্তু ব্রিটিশ এ ব্যবস্থা মানল না। পরিশেষে রাজা উপাধি ছাড়াই নিজের উদ্যোগে বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন রামমোহন। বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিরা সেজন্য অর্থ সংগ্রহ করলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। পরিশেষে নিজ ব্যয়ে রামমোহন উপস্থিত হলেন ইংল্যান্ডে।

সমকালের স্বদেশবাসী তাঁকে বোঝেনি। কিন্তু ইংল্যান্ডে তিনি পেয়েছেন বিপুল সমাদর। লিভারপুলে তিনি এসে পৌঁছান ১৮৩১ এর মে মাস নাগাদ। তখন সেখানেই থাকতেন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক উইলিয়াম রোস্কো। তিনি আন্তরিক সংবর্ধনা জানালেন প্রাচ্যের এই মহান দার্শনিককে। এরপর, রামমোহন বেরিয়ে পড়েন ইংল্যান্ডের কলকারখানা দেখতে। ক্রমে তিনি এসে পৌঁছলেন লন্ডনে। তাঁর আসার দিনটিতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর হোটেলে আসেন বিশ্ববন্দিত দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম। তখন তিনি বৃদ্ধ। রামমোহনের ইংল্যান্ডে বসবাসের যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায়, তিনি যেখানে থাকতেন, ইংল্যান্ডের সেই অঞ্চলে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের এত ভিড় হত যে পুলিশকে যান নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ব্যবস্থা

নিতে হত। ইংল্যান্ডে কোনও ভারতীয়ের এই পরিমান জনপ্রিয়তা সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই বিরল। এখানে, এদেশে এসে রামমোহন নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন নানান সভা সমিতিতে। তাঁর আন্তর্জাতিক মনন তাঁকে সর্বদাই ভাবিয়েছে বিশ্বের মানুষের কল্যানের জন্য। তাদের পরাজয়ে তিনি হয়েছেন ব্যথিত। যেমন, ১৮২১ সালে নেপলসের সেনাবাহিনী, অস্ট্রিয়ার জনসাধারণের উপর প্রবল আক্রমন চালিয়ে বিদ্ধস্ত করে একটা গোটা জনপদকে। এই ঘটনা মানবতার পূজারি রামমোহনকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছিল। তিনি এর প্রতিবাদে 'ক্যালকাটা জার্নাল' এর সম্পাদক জেমস ব্যাকিংহামকে একটি চিঠি লেখেন।

"Under the circumastances I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to Liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful."[৯]

আবার প্রবলের বিরুদ্ধে মানুষের জয়ে তাঁর আনন্দের সীমা থাকত নয়া। জানা যায়, দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্পেনের অধীনতা ছিন্ন করলে তিনি এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন তাঁর বাড়িতে। এমনই বিশ্বজনীনতার আদর্শ নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। তবে সর্বদাই তাঁর লক্ষ্য ছিল, তাঁর স্বদেশকে জাগাতে হবে, দেশবাসীকে দিতে হবে সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার। বোর্ড অফ কন্ট্রোলের প্রাক্তন সভাপতি মি. ওয়েন এর বিচার বিভাগীয় সংস্কারের প্রস্তাব ছিল ভারতবাসীদের প্রতি অপমানজনক। রামমোহন ১৮২৬ এর নভেম্বরে এর বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে আবেদন করেন। স্বভাবতই পার্লামেন্ট তা উপেক্ষা করে। পরবর্তীকালে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের আর এক সভাপতি চার্লস গ্রান্ট আরও একবার জুরি বিল নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করলে রামমোহন আবার তাঁর কিছু প্রস্তাব উপস্থিত করেন। বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ভাবনাচিন্তা লিখিতভাবে প্রকাশ করেন 'Exposition of the practical operation of the Judicial and Revenue system of India' বইটিতে। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সামনে ভারতের রাজস্ব ও বিচারব্যবস্থার উন্নতিকল্পে নিজের অভিমত জানানোর সুযোগ পাওয়া মাত্রই তা ব্যক্ত করলেন নির্দ্বিধায়। প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রজাতান্ত্রিক আধুনিক একটি রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিৎ সে প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং এ ক্ষেত্রেও তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল বিচারব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বৈষম্যমুক্ত, উদার এবং মানবিক করা।

১। সরকারি নির্দেশ Regulation, এবং আইন বা Law মিশ্রিতভাবে বিবেচ্য নয়।
২। দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন Codify বা ধারানিবদ্ধ করা উচিৎ।
৩। আদালতের ভাষা ফার্সির জায়গায় ইংরেজি হওয়া উচিৎ।
৪। Judge -এর কাজ, Magistrate -এর কাজ এবং collector এর কাজ আলাদা করে দিলেই ভালোই হয়।
৫। Supreme Court -এর স্বাধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিৎ।
৬। বিচার ভালোভাবে চালাবার জন্য দেশীয় বিচারক এবং ইউরোপীয় বিচারক একত্রিত ভাবে বসবেন।
৭। দেশীয় বিচারকদের বেতন সন্তোষজনক হওয়া উচিৎ।
৮। আদালতে জাতি ধর্মনির্বিশেষে জুরির বিচারের প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়।
৯। পঞ্চায়েতি প্রথায় বিচার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
১০। হিবিয়াস কর্পাস আইন চালু করা উচিৎ।

১১। সরকারি কর্মচারী কোন 'লাখেরাজ জমি' অধিগ্রহণ করলে তার বিচার জজ- আদালতে হওয়া উচিৎ।
১২। অত্যাচারী, নরঘাতক ধনীদের উপযুক্ত বিচার হওয়া উচিৎ।
১৩। বিচার ব্যবস্থায় গরিব মানুষের সুবিধা- অসুবিধা দেখা সরকারের কর্তব্য।

বিচার-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তাঁর এই প্রস্তাব শুধু সেকাল নয়, একালেও সমান প্রযোজ্য। আগ্রহী পাঠক যদি অনুসন্ধান করেন রাজস্ব সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবগুলির তাহলে দেখবেন, সেখানেও তিনি দরিদ্র কৃষক, প্রজাদের সমস্যা নিয়ে কতটা গভীরভাবে ভাবিত ছিলেন।

রামমোহনের কাছে স্বপ্নের তীর্থভূমি ছিল বিপ্লবের ধাত্রীভূমি ফ্রান্স, যেখানে জন্ম হয়েছে রুশো, ভলতেয়ার প্রমুখ মহান দার্শনিকদের। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী যেদেশে ধ্বনিত হয়েছিল। সেই ফ্রান্সে যাওয়ার ইচ্ছা তিনি পোষণ করেছেন বরাবর। ১৮৩০ এর জুলাই বিপ্লব তাঁকে উদ্বেলিত করেছিল। যাত্রাপথে কেপটাউন বন্দরে ফরাসি জাহাজে বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকা দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। পতাকার দর্শন মাত্র তাকে অভিবাদন জানান। ইংল্যান্ডে থাকাকালীনই ফ্রান্সে যাওয়ার চেষ্টা করে রামমোহন যখন জানতে পারেন যে, সরকারের অনুমতি ছাড়া সেখানে যাওয়া যাবে না, তার প্রতিবাদে তিনি ফ্রান্সের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে সওয়াল করলেন দেশে দেশে মানুষের অবাধ চলা ফেরার সপক্ষে। প্রস্তাব করলেন বিশ্বশান্তির জন্য একটি অভিনব সংঘ বা Congress তৈরি করার।

"It is now only but unbiased common sense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches..... by such a congress al matters of difference, wheather political or commercial, affecting the Natives of any two civilized countries with constitutional Governments, mught be settled amicably and justy to the satisfaction of both and profound peace and friendly feelings might be preserved between them from generation to generation."[১০]

এই চিঠিটি মানব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। রামমোহন সর্ব অর্থেই ছিলেন আন্তর্জাতিক। সারাবিশ্বের সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষের জন্য তাঁর যে সংঘ গড়ে তোলার প্রস্তাব তারই বাস্তব রূপায়ণ দেখতে পাই প্রায় একশো বছর পরে যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর বুকে জাতিসংঘ গঠনের প্রচেষ্টা এবং ১৯৪৮ এর মানবাধিকার সনদে। অবশেষে প্যারিসে পৌঁছে বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষের সহৃদয় আতিথেয়তা পেলেন তিনি। 'সোসাইটি এশিয়াটিক অফ প্যারিস' তাঁকে দেয় সম্মানীয় সদস্যপদ। রাজা লুই ফিলিপ তাঁকে আমন্ত্রণ জানান ভোজসভায়। সব মিলিয়ে বিপুলভাবে ফরাসি দেশ সংবর্ধিত করে রামমোহনকে।

রামমোহনের জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল তাঁর দেশের মানুষের জন্য। ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে আদর্শ আর নিষ্ঠার শিখরে। মানবসভ্যতার কাছে সেই আদর্শ অমূল্য সম্পদ। একথা একুশ শতকের এই সময়ে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতের 'প্রথম আধুনিক মানুষ'-এর মুক্ত উদারনৈতিক, মানবিক, যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শনের খুব বেশি প্রয়োগ আমরা আমাদের ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রযাত্রায় করে উঠতে পারিনি। শুধু অক্ষমতা নয়, এই না পারার নেপথ্যে সদিচ্ছার অভাবই বড় কারণ। তবু, আজ যখন ফিরে তাকানো যায় উনিশ শতকের ম্রিয়মাণ বাংলায় জন্মগ্রহণ করা এই বিরাট মাপের মানুষটির গৌরবময় জীবনের দিকে তখন আশা জাগে, একদিন আলোকবর্তিকা নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন যে আঁধারের পথে সে পথেই ধীরে

ধীরে জ্বলে উঠেছে আলো। সেই যাত্রার শরিক হয়েছেন বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আলোর পথিকেরা। গড়ে উঠেছে উনিশ ও বিশ শতকের সৃষ্টিশীল সংগ্রামী ইতিহাস। সে পথেই সমস্ত অন্যায়, অপশাসন আর রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে মানুষের যুথবদ্ধ অভিযান সভ্যতাকে পৌঁছে দেবে তার চরম উৎকর্ষে।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চারিত্রপূজা। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, নতুন সংস্করণ ১৩৫১। পৃ. ৬২। মুদ্রিত।
২। ঘোষ, ড. অজিতকুমার (সম্পা.)। রামমোহন রচনাবলী। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ. ৬৫। মুদ্রিত।
৩। তদেব। পৃ. ৭৫-৭৬।
৪। Selected Works of Raja Rammohun Roy. Publication Division, Ministry of Information and Brodcasting, Govt. of India, 1958. page 78. Printed.
৫। ঘোষ, ড. অজিতকুমার (সম্পা.)। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৬২।
৬। Ghose, Jogendra Chunder. The English Works of Raja Rammohun Roy. Vol. – 1. Kolkata: Forgotten Books, 1901. page 216. Printed.
৭। ঘোষ, ড. অজিতকুমার (সম্পা.)। প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা. ৩৪৪।
৮। তদেব। পৃ. ৪৩৬।
৯। তদেব। পৃ. ৪৫৫।
১০।তদেব। পৃ. ৪৮৭।

গ্রন্থঋণ:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। রামমোহন রায়। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৩৪৯। মুদ্রিত।
২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চারিত্রপূজা। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, নতুন সংস্করণ ১৩৫১। মুদ্রিত।
৩। ঘোষ, ড.অজিতকুমার (সম্পা.)। রামমোহন রচনাবলী। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩। মুদ্রিত।
৪।SELECTED WORKS OF RAJA RAMMOHUM ROY. AHMEDABAD: PUBLICATION DIVISION, MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, GOVT. OF INDIA. FIRST PUBLICATION 1958. Printed.
৫। শাস্ত্রী, শিবনাথ। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ। কলকাতা: এস. কে. লাহিড়ী এন্ড কোং, ১৯৯০। মুদ্রিত।
৬। ভৌমিক, তাপস (সম্পা.)। কোরক সংকলন, সার্ধ-দ্বিশতবর্ষে রামমোহন রায়। কলকাতা: ফেব্রুয়ারি ২০২২।